OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 79
Website: https://tirj.org.in, Page No. 667 - 681
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 667 - 681
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

ভারতে বৈদিক যুগে শিক্ষা পদ্ধতি

ড. পিনাকী শঙ্কর পাণ্ডে
পোস্ট ডক্টরেট রিসার্চ স্কলার
Email ID : pinakiPandey68@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword ***Abstract***

Discussion

ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল মোক্ষ বা মুক্তি অর্জন। শিক্ষার ধরণ এবং বিষয়গুলি উদ্দেশ্য অনুসারে নির্ধারিত হয়েছিল। মুক্তির প্রকৃতি এবং তা অর্জনের উপায় সম্পর্কে চিন্তাভাবনার বিকাশের সাথে সাথে শিক্ষার প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়েছে। এখানে এসে ভারতীয় চিন্তাভাবনা দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। যেগুলো পরবর্তীতে বৈদিক ও শ্রমণ মতাদর্শ নামে পরিচিত হয়। শিক্ষার লক্ষ্য তখনও মোক্ষ বা মুক্তিই ছিল, কিন্তু মুক্তির প্রকৃতি এবং এর অর্জনের উপায় সম্পর্কে মতামতের পার্থক্য শিক্ষার প্রকৃতিকে দুটি ধারায় বিভক্ত করেছিল। পরবর্তীকালে, এই উভয় ধারা সমান্তরাল ভাবে বিকশিত হতে থাকে। একদিকে বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থা বিকশিত হয়েছিল এবং অন্যদিকে শ্রমণ শিক্ষাব্যবস্থাও বিকশিত হয়েছিল। বৈদিক শিক্ষার প্রধান দেবতা ছিলেন ঋষিরা। তাঁর আশ্রমগুলি ছিল শিক্ষার কেন্দ্র। সেগুলো ছিল গুরুকুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়। ঋষিকুল ছিলেন গুরু এবং চর্চাকারী উভয়ই।

শ্রমণ ছিলেন শ্রমণ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা। বৈদিক ঋষিদের মতো, শ্রমণরাও আশ্রমবাসী ছিলেন না। আবাসিক গুরুকুলগুলি গড়ে উঠতে পারেনি। শ্রমণ ছিল শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু, কিন্তু শুরুতে শ্রমণ ঐতিহ্যে ভ্রাম্যমাণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের উত্থানের সাথে সাথে শ্রমণ শিক্ষাব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন আসে এবং আবাসিক শিক্ষা কেন্দ্র তৈরি শুরু হয়।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস জরিপ করার সময়, এটি নিম্নরূপ দেখা যেতে পারে।

বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থা –

(১) বৈদিক শিক্ষার প্রকৃতি - ভারতীয় সংস্কৃতির দীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে ধর্মের প্রাধান্য সর্বদাই বিদ্যমান। ধর্ম কেবল মানব জীবনের চূড়ান্ত অতীন্দ্রিয় লক্ষ্যকেই নির্দিষ্ট করে না, বরং এই লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসেবে কর্ম, উপাসনা এবং জ্ঞানের বিস্তৃত পদ্ধতিও নির্ধারণ করে। শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাব স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। ভারতীয় আর্যদের প্রথম সাহিত্যিক কণ্ঠস্বর ঋগ্বেদীয় মন্ত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল। ঋগ্বেদের রচনা সাহিত্যে শিক্ষার উপাদানসমূহ প্রায় হাজার বছর পরেও, ধর্মীয় অনুভূতি ভারতীয় সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।[১] ভারতীয় দর্শনে, মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য একটি বিশেষ ধরণের দার্শনিক চিন্তাভাবনা পদ্ধতি দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়, যা উপনিষদে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত ব্রহ্ম বা পরম সত্তাকে অর্জন করা, যা তিনি নিজেই। সমগ্র

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 79
Website: https://tirj.org.in, Page No. 667 - 681
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দৃশ্যমান বিশ্বও একই ব্রহ্ম দ্বারা পরিব্যাপ্ত। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" অর্থাৎ "সকল দৃশ্যমান বস্তুই ব্রহ্ম।" জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে পার্থিব পার্থক্য আসলে অজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত এবং মিথ্যা। অতএব, মানুষের উচিত যথাযথ উপাসনা করা এবং তার বিবেককে শুদ্ধ করে সর্বোচ্চ জ্ঞান অর্জন করা, যার মাধ্যমে সে ব্রহ্মের প্রকৃত রূপ বুঝতে এবং সেই রূপে নিজেকে বিলীন করতে সক্ষম হতে পারে। আত্মা এবং পরমেশ্বরের একীকরণ প্রতিষ্ঠিত না হলে জীবের কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। অতএব, ব্রহ্ম, আত্মা এবং জগতের মধ্যে উপরে উল্লিখিত অপরিহার্য সম্পর্কের জ্ঞানকে 'বিদ্যা' বলা হয়, এটিই প্রকৃত জ্ঞান। এই সম্পর্কের অজ্ঞতা বা এতে বিশ্বাসের অভাবই অজ্ঞতা। "ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা" অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা। অজ্ঞতার অন্ধকার দূর না হওয়া পর্যন্ত জগৎকে সত্য বলে ধারণা করা এবং ব্রহ্মকে না দেখানো অব্যাহত থাকে। জ্ঞানের আলো দ্বারা ভিত্তি নির্ধারণের সাথে সাথেই এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে স্ব-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্ম-অস্তিত্বই চূড়ান্ত সত্য এবং ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত জগৎ, যেমন দড়িতে প্রতিষ্ঠিত সাপ অর্থাৎ রজ্জু ভ্রম, মিথ্যা। এই জ্ঞান, পরম ব্রহ্মের উপলব্ধি ইন্দ্রিয় দ্বারা উৎপন্ন বাহ্যিক জ্ঞানের মাধ্যমে সম্ভব নয়। এই ধরণের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মস্তিষ্ক কলুষিত হয়ে পড়ে এবং তার আসল প্রকৃতি ভুলে যায়। অজ্ঞতাই আত্মাকে ব্রহ্ম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে।[৪] যার ফলে আত্মাও কলুষিত হয়, তাই বাহ্যিক বস্তুগত জ্ঞান, প্রকৃতপক্ষে, প্রকৃত জ্ঞান বা চূড়ান্ত জ্ঞান অর্জন কেবল মনের প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ এবং অন্তর্মুখী ধ্যানের মাধ্যমেই সম্ভব। ফলস্বরূপ, শিক্ষা হল একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন সর্বোচ্চ জ্ঞানের সন্ধানকারী, বাহ্যিক জগৎ থেকে তার সমস্ত চিন্তাভাবনা সংগ্রহ করার পরে, সেগুলিকে অভ্যন্তরীণ জগতে আরোপ করে এবং একনিষ্ঠ ভক্তির সাথে, ব্রহ্মকে উপলব্ধি এবং অর্জনের চেষ্টা করে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, - "অধ্যাত্ম বিদ্যা বিদ্যানামৃ"[৫] অর্থাৎ অধ্যাত্মবিদ্যা হল জ্ঞানের জ্ঞান। অর্থাৎ জ্ঞানের মধ্যে আমি আধ্যাত্মিক জ্ঞান। জীবনের বিষয়গুলি কেবল নশ্বর জীবনের সমাধানের উপর কেন্দ্রীভূত থাকতে পারে না। এটি একটি জীবনের সমাধান খুঁজে বের করতে হবে যার পরিণতি মৃত্যু নয়, বরং পরিত্রাণ। এই নির্দিষ্ট কার্যকলাপগুলি ভারতীয় সংস্কৃতিতে ধর্মের বিস্তৃত পরিসরে অন্তর্ভুক্ত এবং কর্ম, উপাসনা এবং জ্ঞানের নির্দিষ্ট ব্যবস্থার সাথে জড়িত। অতএব, 'ঋত জ্ঞানন্ন মুক্তিঃ' অনুসারে, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় কেবল জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়নি, বরং এই শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্ম কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্য এবং আচরণের শিক্ষাও বাধ্যতামূলক ছিল। গীতার শিক্ষা হল – "স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।"[৬] যে মানুষ নিজের কর্মে নিয়োজিত থাকে সে পূর্ণতা লাভ করে এবং "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিমৃ।। তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং-তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ। জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি।।"[৭]

যিনি ধর্মগ্রন্থের নির্দেশ উপেক্ষা করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী জীবনযাপন করেন। সে পরিপূর্ণতা বা সুখ বা পরম গন্তব্যও পায় না তাই কর্ম ও কর্ম ব্যবস্থায় শাস্ত্রই আপনার জন্য কর্তৃত্ব। এটি বুঝতে পেরে শাস্ত্রে নির্দেশিত কর্ম সম্পাদন করা উচিত।

এইভাবে, শাস্ত্র অনুসারে কর্মক্ষেত্রে কর্তব্য পালন করাই হল সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারাংশ এবং সমস্ত অগ্রগতির মূল।' ব্যক্তিগত মর্যাদার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি, ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ সর্বজনীন বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বোধ জাহির করেছে যা বিশ্বের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতির সবচেয়ে মূল্যবান উপহার।[৮]

(২) **বৈদিক শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ - ১.** এটি একটি মনোরম বনাঞ্চলে অবস্থিত ছিল, জেলার সংঘর্ষ এবং কোলাহল থেকে দূরে। প্রাচীন ভারতের ছাত্ররা প্রকৃতির কোলে ঋষির আশ্রমে এখানে শারীরিক ও মানসিকভাবে নিজেদের বিকশিত করত। বিশুদ্ধ বাতাস, স্রোতস্বিনীর পরিষ্কার জল, মিষ্টি সবুজ ফল, পুষ্টিকর শিকড় ও কন্দ এবং গুরুর আশীর্বাদ তার শরীরকে শক্তিশালী ও কোমল করে তোলে। খোলা আকাশের অবিরাম সাহচর্য, সবুজ বন, সুন্দর ভাষাভাষী মানুষ, নিষ্পাপ হরিণ পাখি ইত্যাদি তার হৃদয়ে এক স্বাভাবিক আনন্দের জন্ম দিত, যেখানে কোনও ধরণের আকাঙ্ক্ষা বা কোনও ধরণের দ্বন্দ্ব ছিল না। গুরুকুলের ছাত্রদের সামাজিক জীবন ছিল ভ্রাতৃত্ববোধে পরিপূর্ণ। সকল ব্রহ্মচারীই সমান, উচ্চ-নীচের কোনও পার্থক্য নেই। তিনি তার ছাত্রজীবন কাটিয়েছেন। গুরুর সেবা, ভূমির সেবা, গরুর সেবা সকলেরই সমানভাবে কাম্য ছিল।

রাজপুত্র এবং সাধারণ ছাত্র উভয়ই হোমের জন্য কাঠ বা সমিধ সংগ্রহ করত। তারা দুজনেই ভিক্ষা চাইত, দুজনেই একই রকম পোশাক পরত এবং দুজনেই একই রকম খাবার খেত।

২. প্রাচীন ছাত্ররা গুরুকুল সমাজকে নেতৃত্ব প্রদান করত। আজকের শিক্ষার্থীর স্কুল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমাজের কাছ থেকে নেতৃত্ব গ্রহণ করে। প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক রশ্মি বনাঞ্চলের ছাত্রদের গুরুকুল থেকে বিকিরণ করত। আলোর উৎস শহর বা রাজপরিবার ছিল না, বরং ছিল ঋষিদের আশ্রম। কবীন্দ্র রবীন্দ্রের মতে, ভারতীয় সংস্কৃতি শহরে নয় বরং বন-প্রাদেশিক আশ্রমে তৈরি হয়েছিল।[৯]

৩. ভারতের প্রাচীন বিদ্যালয়গুলি ছিল স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান যার কোনও বহিরাগত রাষ্ট্র বা সামাজিক আধিপত্য ছিল না। গুরুর আদেশ ছাড়া, ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের ক্ষতি করার জন্য একটি আঙুলও তোলা যেত না। এই বিদ্যালয়গুলির বিন্যাস, বিষয়, শিক্ষাদান পদ্ধতি ইত্যাদি শিক্ষকরা নিজেরাই আধ্যাত্মিক আদর্শের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতেন, যার স্রষ্টা এবং রক্ষক ছিলেন ঋষিরা। কোনও বহিরাগত শক্তির হস্তক্ষেপ করার অধিকার ছিল না। ফলস্বরূপ, প্রাচীন ভারতের স্কুল বা গুরুকুলগুলি কোনও বাধা ছাড়াই তাদের লক্ষ্য অর্জনে নিযুক্ত ছিল।

৪. প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় জীবন ও পৃথিবীর মধ্যে একটি সুন্দর সমন্বয় ছিল, যার ফলে একটি সমন্বিত ব্যক্তিত্বের উত্থান ঘটে। এই ব্যক্তিত্ব, বস্তুগত সম্পদ উপভোগ করা সত্ত্বেও, সর্বদা মানবিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ এবং সমৃদ্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত দেবত্ব অর্জন করেছিলেন, যা ছিল তার লক্ষ্য।

৫. ব্রহ্ম বা মোক্ষ লাভের সমস্যাটি ছিল ব্যক্তিগত। অতএব, প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ব্যক্তি। প্রাচীন ভারতের শিক্ষক কোনও শ্রেণী বা বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন একজন নির্দিষ্ট ছাত্র বা শিষ্যের গুরু, যার সমগ্র ব্যক্তিত্বের উপর তাঁর সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান ছিল এবং যার কাঙ্ক্ষিত বিকাশের জন্য তিনি নিরন্তর কাজ করতেন। গুরুর ব্যক্তিগত সুরক্ষা ছাড়া শিষ্যের ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। অতএব, প্রাচীন ভারতের ছাত্র তার পিতামাতা এবং বাড়ির পরিবেশ থেকে দূরে সরে যেত এবং তার গুরুর চরণে নিজেকে সমর্পণ করত। উপনয়নের মাধ্যমে তাঁর দ্বিতীয় জন্ম হয় এবং তিনি দ্বিজ নামে পরিচিত হন।

৬. প্রাচীন ভারতে শিষ্য কেবল গুরুর ছাত্রই ছিলেন না, বরং গুরু পরিবারের সদস্যও ছিলেন। তিনি পরিবারের দৈনন্দিন কাজে অংশগ্রহণ করতেন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার পাঠ শিখতেন।

৭. শিক্ষার্থীর শিক্ষা কেবল মানসিক ছিল না, বরং ব্যবহারিক ছিল। বাহ্যিক বিশ্বের কার্যকলাপ। তিনি ব্যক্তিগত আচরণ এবং সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। অভ্যন্তরীণ জগতের শিক্ষাও ছিল অভিজ্ঞতামূলক। তাকে তার গুরুর কথা কেবল বক্তৃতা হিসেবে শুনতে হয়নি; বরং, তাকে আধ্যাত্মিক স্ব-অধ্যয়নের মাধ্যমে সেই শব্দগুলির আত্মা বুঝতে হয়েছিল। কেবল মন্ত্র শ্রবণ করেই পরম জ্ঞান অর্জন সম্ভব ছিল না। এর জন্য, মনন এবং ধ্যান প্রয়োজন ছিল, যাতে কেউ পরম সত্যের আলোর দর্শন পেতে পারে। শিক্ষকের কথা শোনার পর ধ্যান করা হয়। এই ধ্যান সম্পূর্ণ জ্ঞানের কারণ - "শ্রবণং তু গুরোঃ মননংতদন্তরম্। নিদিধ্যাসনমিত্যেতৎপূর্ণবোধস্য কারণম্।।"[১০] শ্রবণ, ধ্যান এবং নিদিধ্যাসন, এই তিনটি প্রক্রিয়া তাঁর মানসিক শিক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শ্রবণের মাধ্যমে তিনি গুরুর বাক্যের বাহ্যিক রূপ গ্রহণ করতেন, ধ্যানের মাধ্যমে তিনি এই রূপের আত্মাকে চিনতেন এবং ধ্যানের মাধ্যমে তিনি তা আত্মার কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। এইভাবে শিষ্যের মানসিক বোঝা তার ব্যক্তিত্বের একটি অংশ হয়ে ওঠে, যা তিনি কখনও ফেলে দিতে পারেননি এবং ফেলতেও চাননি। তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তা 'গাধার বোঝা' ছিল না যা আধুনিক শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার হলে তাদের পিঠ হালকা করার জন্য ফেলে দেয়।

৮. ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্মফলের প্রতি কোনও অবহেলা ছিল না, তবে এটি কেবলমাত্র সেই পরিমাণেই প্রত্যাশিত ছিল যাতে এটি মোক্ষ অর্জনে সহায়তা করতে পারে। কর্মের উদ্দেশ্য জীবকে জগতের সাথে আবদ্ধ করা নয়, বরং তা থেকে মুক্ত করা।যে কর্ম বন্ধনের জন্য নয়, সেই জ্ঞানই মুক্তির জন্য - "তৎকর্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।" কর্মই ছিল ধর্ম, ইচ্ছা নয়; এটা একটা কর্তব্য ছিল, ইচ্ছা ছিল না; মুক্তি ছিল। বন্ধন নেই।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 79
Website: https://tirj.org.in, Page No. 667 - 681
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

(৩) **গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক** - গুরুর আশ্রমে প্রবেশের জন্য, শিষ্যকে সমিধের সাথে উপস্থিত হতে হত। এই রীতির অর্থ ছিল এই যে, তিনি গুরুর যজ্ঞবেদীর আগুন অবিরাম জ্বালিয়ে রাখতে এবং গুরুর সেবা ও যত্ন নিতে বাধ্য ছিলেন। মুণ্ডকোপনিষদ[১১] থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে যে অভিলাষীকে 'সমিতপাণিঃ' - সমিধ হাতে নিয়ে ব্রহ্মগুরুর সামনে উপস্থিত হওয়া উচিত। ছান্দোগ্য উপনিষদে[১২], আত্মার জ্ঞান অর্জনের জন্য, দেবরাজ ইন্দ্র এবং অসুররাজ বিরোচন উভয়েই হাতে কাঠ নিয়ে প্রজাপতির সামনে উপস্থিত হন। 'সামিলনী'-তে ইন্দ্র আরও তিনবার প্রজাপতির কাছে এসেছিলেন। কৌষিতকি ব্রাহ্মণ উপনিষদে, গর্গের প্রপৌত্রের ছবিতে আরুণি, একজন জিজ্ঞাসু ব্যক্তির ছদ্মবেশে জলের পাত্রে কাঠ বহন করতে দেখা যায়।

এই উপনিষদে, গার্গ্য বালাকি ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনের জন্য কাঠ হাতে নিয়ে ক্ষত্রিয় রাজা অজাতশত্রুর কাছে গিয়েছিলেন এবং তাঁর শিষ্য হওয়ার অনুরোধ করেছিলেন।[১৩] শতপথ ব্রাহ্মণে[১৪] আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে শিষ্যকে তার গুরুর সামনে সমিধ নিয়ে উপস্থিত হওয়া উচিত। অতএব, প্রাচীন ভারতে দেখা যায় শিষ্য কেবল গুরুর ছাত্রই ছিলেন না, বরং তাঁর সেবকও ছিলেন। ভগবদগীতায়[১৫] উপরোক্ত গুরু-সেবার স্পষ্ট ক্রম 'পরিপ্রশ্নেন সেবা' আকারে দেওয়া হয়েছে। উপকোষল তার গুরু সত্যকাম জাবালীর যজ্ঞশালার আগুনও বারো বছর ধরে পরিবেশন করেছিলেন।[১৬] এই সেবাগুলি সম্পাদন করার সময়, তিনি মানসিক অধ্যয়নের জন্য অবসর পেতেন এবং এর পূর্ণ ব্যবহারও করতেন।[১৭] গুরুর কর্তব্য ও দায়িত্বও স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল। তাকে তার শিষ্যকে নিজের ছেলের মতোই দেখাতে হয়েছিল। শিষ্যের সকল সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা তার কর্তব্য ছিল। তাই, গুরুর ভালোবাসা এবং ভালো আচরণের কারণে, অনেক শিষ্য এমনকি তাদের ঘরবাড়ি ভুলে গিয়ে সারা জীবন গুরুর সাথেই থাকতেন। এই ধরনের শিষ্যদের 'অ্যান্টেভাসিন' বলা হত। স্নেহপূর্ণ আচরণ, বাসস্থান, খাদ্য, পোশাক প্রদানের পাশাপাশি, শিষ্যকে প্রকৃত জ্ঞান প্রদান করাও গুরুর কর্তব্য ছিল যাতে শিষ্য ব্রহ্ম লাভ করতে পারে –

> "তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মাবিদ্যাম্।।[১৮]

পণ্ডিত ঋষি তার কাছে গেলেন এবং তিনি পুরোপুরি শান্ত এবং শান্ত ছিলেন। যার দ্বারা কেউ অবিনশ্বর পুরুষকে জানে এবং সত্যকে সে সারমর্মে বলেছে সেই পরম সত্যের জ্ঞান। একজন শ্রোত্রী, ব্রহ্ম-ভক্ত মহাত্মার উচিত তার শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যার মর্ম ব্যাখ্যা করা, যিনি তাঁর আশ্রয়ে এসেছেন - যার মন সম্পূর্ণ শান্ত, যিনি তার মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। যাতে শিষ্য শাশ্বত এবং অবিনাশী পরম ব্রহ্ম পুরুষোত্তমের জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। এছাড়াও, গুরুর শিষ্যের কাছ থেকে কোনও আধ্যাত্মিক উপাদান গোপন রাখা উচিত নয়। গুরুর কর্তব্য ছিল শিষ্যের কাছে ব্রহ্মের প্রকৃত রূপকে তার প্রকৃত রূপে উপস্থাপন করা।

> "ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি।"[১৯]

তুমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। আমি আপনাকে বলব যে আপনি প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। আমি তোমাকে সত্য বলব। আমি তোমাকে সত্যিটা বলব। এই মন্ত্রগুলি ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান এবং তার ব্যাখ্যা প্রচার করে। কেবলমাত্র যোগ্য ব্যক্তিই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হতে পারতেন – "নাপুত্রায় দাতব্যং নাশিষ্যায় দাতব্যম্। সম্যক্ পরীক্ষ্য মাসং ষণ্মাসবৎসরম্।।"এটি একটি পুত্র বা একটি শিষ্য দেওয়া উচিত নয় যত্ন সহকারে পরীক্ষা করার পরে এটি বছরে এক মাস বা ছয় মাস দেওয়া উচিত।অযোগ্য পুত্র এবং শিষ্যরাও এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে পারে। মৈত্রায়ণ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মজ্ঞান কেবলমাত্র সেই শিষ্যকেই প্রদান করা উচিত যার তার গুরুর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে এবং যিনি প্রয়োজনীয় গুণাবলীতে সমৃদ্ধ।[২০]

শিক্ষা শুরু করার আগে শিক্ষার্থীকে কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হত। যদি সে এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়, তাহলে শিক্ষকের তাকে ব্রহ্মজ্ঞান না শেখানোর স্বাধীনতা ছিল।[২১] এমনকি পরবর্তী বৈদিক যুগেও, আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রায়শই পিতার দ্বারা প্রদান করা হত। গুরু ছাড়াও, শ্বেতকেতু তার বাবা আরুণির কাছ থেকেও শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করেছিলেন।[২২] ভৃগু তার পিতা বরুণের কাছ থেকে ব্রহ্মজ্ঞানের শিক্ষা লাভ

করেছিলেন।[২৩] ভৃগুতে, বারুণী তার পিতা বরুণের কাছে এসে বললেন, - "পড়, ভগবান ব্রহ্মা।" - "ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ বরুণং পিতরমুপসসার অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি।" এমনকি পরবর্তী বৈদিক যুগেও ব্রাহ্মণদের জন্য ব্রহ্মচর্য বাধ্যতামূলক ছিল না।[২৪] শ্বেতকেতুর বাবা স্বেচ্ছায় তার ছেলেকে পড়াশোনার জন্য পাঠিয়েছিলেন।[২৫] বৈশ্বানর আত্মার জ্ঞান অশ্বপতি কৈকয়ী কর্তৃক প্রাচীন শালের শ্রোত্রী প্রভৃতি মহান গৃহস্থদের উপনয়ন না দিয়েই প্রদান করা হয়েছিল।[২৬] জাবালার পুত্র সত্যকামও স্বেচ্ছায় পড়াশোনা শুরু করেছিলেন।[২৭] ছান্দোগ্য উপনিষদের এই উদাহরণগুলি থেকে স্পষ্ট যে পরবর্তী বৈদিক যুগে ব্রহ্মচর্য আশ্রম অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক ছিল না। চারটি আশ্রমের ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তা পরে তুলে ধরা হয়েছিল। এই আশ্রমগুলির সংগঠন উপনিষদের যুগে শুরু হয়েছিল, কিন্তু এটি ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।[২৮]

(৪) বৈদিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম - ঋগ্বেদীয় যুগে, শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের বিষয়গুলি কেবল পাঠ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। মহর্ষি যস্কের মতে, বেদের একজন শিক্ষার্থীর ব্যাকরণের সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা উচিত।[২৯] "যারা শিক্ষকের সাথে থাকতে ইচ্ছুক নয় এবং ব্যাকরণে দক্ষ নয়" তাদের আধ্যাত্মিক নির্দেশনা প্রদান করা উচিত। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে ঋগ্বেদের সময়েও ব্যাকরণ অধ্যয়ন প্রচলিত ছিল।[৩০] কিছু পণ্ডিতের মতে, শিক্ষা ইত্যাদির মতো বেদাঙ্গ অধ্যয়ন ঋগ্বৈদিক যুগেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। শিক্ষা শব্দ 'শিক্ষ্ ধাতু' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'দান করা'। শিক্ষার মাধ্যমে গুরু শিষ্যকে বেদ শোনাতেন। এই শিক্ষার যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য, উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিতের উচ্চারণ এবং গাওয়ার প্রতি মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য ছিল। এগুলো বেশিরভাগই শিক্ষার বিষয়। দ্বিতীয় বেদাঙ্গ কল্পের মাধ্যমে, বৈদিক মন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত যজ্ঞের ব্যবহারিক পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা হয়েছিল। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে এমন একটি যজ্ঞের উল্লেখ আছে যা এক বছর ধরে চলত। এই ধরনের যজ্ঞের জন্য কল্প পদ্ধতির প্রয়োজন ছিল।[৩১] বৈদিক মন্ত্রের অর্থ সঠিকভাবে বোঝার জন্য, ব্যাকরণের সাথে নিরুক্তের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অর্থপূর্ণ বৈদিক মন্ত্রগুলি অর্থহীন শব্দের (নিগদেনৈব শব্দ্যতে) অনুরূপ ছিল। যে ব্যক্তি বৈদিক মন্ত্রের অর্থ সম্পর্কে অবগত ছিল না, সে গাধার মতো, যে কেবল চন্দনের ভারই অনুভব করত, তার সুগন্ধ নয়।[৩২] 'ছন্দ' শিক্ষা ঋগ্বেদিক যুগেও প্রচলিত ছিল বলেও বিবেচনা করা উচিত, যা ছাড়া মন্ত্রের বিভিন্ন উপাদান এবং তাদের সংমিশ্রণ বা গঠন সম্পর্কে জ্ঞান অসম্ভব ছিল। জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রকৃতির সেই নিয়ম এবং তথ্যগুলি বোঝা সম্ভব যেগুলি থেকে বেশিরভাগ বৈদিক মন্ত্র অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এটাও ধরে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত যে, বেদঙ্গের মৌলিক বিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যার শিক্ষা অবশ্যই ঋগ্বেদিক যুগে প্রচলিত ছিল। (ঋগ্বেদ ৩.৮৬.৯) "বক্তবানামং মলিনমৃ"-এর ধারণা দেয়; এর ব্যবহার কেবল তাদের জন্য বলে মনে হয় যারা পূর্বপক্ষ এবং সিদ্ধান্তিদের পরস্পরবিরোধী ধারণাগুলির সমাধান করতে চান। ঘাত, সত্য, রত, ধর্ম এবং ব্রত শব্দগুলি সেই প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকেও নির্দেশ করে যার দ্বারা সমগ্র বিশ্বজগত পরিচালিত হত।

পরবর্তী বৈদিক যুগে আচার-অনুষ্ঠানের প্রাধান্যের কারণে, ভারতীয় শিক্ষা বিশেষভাবে বলিদানের আচারের সাথে সম্পর্কিত হয়ে ওঠে।[৩৩] যজ্ঞের চারটি প্রধান প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য, নিম্নলিখিত চার শ্রেণীর পুরোহিত ছিলেন - ১. হোতা, ২. উদ্গাতা, ৩. অধ্বর্যু এবং ৪. ব্রহ্মা।

হোতা, পুরোহিতরা মূলত ঋগ্বেদের সাথে যুক্ত ছিলেন। এইভাবে, তিন হাজার পুরোহিতের জন্য তিনটি স্বাধীন বেদ ছিল, যার প্রতিটির বিশেষ অধ্যয়নের জন্য বৈদিক পুরোহিতরা নিযুক্ত হয়েছিলেন। ফলস্বরূপ, ঋগ্বেদীয় বিদ্যালয় তিনটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। প্রতিটি শাখা তার ছাত্রদের একটি করে বেদ শিক্ষা দিত। হোতু ছাত্ররা বিশেষভাবে ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করত। সামবেদ ও অধ্বর্যু-যজুর্বেদের উদ্গাতু। যজ্ঞের সমস্ত কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান করার জন্য ব্রাহ্মণ ছাত্রের জন্য তিনটি বেদের জ্ঞান থাকা অপরিহার্য ছিল। অথর্ববেদ একটু পরে আবির্ভূত হয় এবং বেদ বৃত্তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য এটিকে অনেক প্রচেষ্টা করতে হয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে, এই বেদের সাথে সম্পর্কিত শাখাগুলিও আবির্ভূত হয়। প্রতিশাখ্য সাহিত্যও এই হোতা পুরোহিতদের অবদান ছিল। সময়ের সাথে সাথে, যজ্ঞ সম্পাদনের পদ্ধতিতে অনেক পার্থক্য দেখা দেয় এবং পতঞ্জলির সময়কালে, ১০১টি মতামত তৈরি হয়েছিল। অধ্বর্যু পুরোহিতদের যজ্ঞের সরঞ্জাম ইত্যাদির প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর তদন্ত করা হয়েছিল। যজ্ঞের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ, বেদীর পরিমাপ নির্ধারণ এবং এর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 79
Website: https://tirj.org.in, Page No. 667 - 681
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আনুপাতিক রূপ পর্যালোচনা, যজ্ঞের জন্য উপযুক্ত ঋতু এবং সময় নির্ধারণে অনেক চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল, যার ফলে অনেক ভৌতবিজ্ঞান এবং হস্তশিল্পের সৃষ্টি হয়েছিল। জ্যামিতি, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিত ইত্যাদির মতো ভৌত বিজ্ঞানের অনুপ্রেরণা এই অধ্বর্য পুরোহিতদের কাছ থেকে এসেছিল। বলির জন্য পশুর শারীরস্থান উদ্ভূত হয়েছিল। সাধারণ বৈদিক গুরুকুলে শিক্ষা সম্পন্ন করার পরেও কিছু ছাত্র সন্তুষ্ট হতেন না এবং তারা সুপরিচিত ব্রহ্মজ্ঞানীদের পায়ের কাছে বসে সর্বোচ্চ জ্ঞান অর্জন করতেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত নারদ ও সনৎকুমারের কথোপকথন অনুসারে, উপনিষদের যুগে শিক্ষার অনেক বিষয় যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছিল। নারদ সনৎকুমারকে অনুরোধ করেন – "প্রভু! দয়া করে আমাকে কিছু উপদেশ দিন।" সনৎকুমার উত্তর দেন, "নারদ, দয়া করে নিজেকে আমার কাছে উপস্থাপন করুন এবং আপনি যা জানেন তা আমাকে বলুন, তারপর আমি আপনাকে আরও বলব।" তিনি ভদ্র কণ্ঠে নারদকে বললেন – "প্রভু, আমি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ জানি, এগুলি ছাড়াও আমি ইতিহাস ও পুরাণ আকারে পঞ্চম বেদ জানি। বেদ ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধ-কল্প, রাশি (গণিত), দেব বিদ্যা, নিধিবিদ্যা, দেববিদ্যা, পরিবেশ-বিদ্যা, দেববিদ্যা। ব্রহ্ম-বিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্র-বিদ্যা, সর্পবিদ্যা, আমি দেব-জন-বিদ্যাও জানি (নৃত্য সঙ্গীত ইত্যাদি)।"[৩৪] যেমন আগুনের জ্বালানি ভেজা, তেমনি তা থেকে আলাদা আলাদা ধোঁয়া বের হয়, হে মৈত্রেয়ী! ঠিক তেমনি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস-পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ, শ্লোকসূত্র, মন্ত্র-বর্ণনা এবং অর্থবাদ - এগুলি সবই এই ঈশ্বরের নিঃশ্বাস।[৩৫] এই বিদ্যাগুলি ছাড়াও, উপনিষদ সাহিত্যে একটি বিশেষ বিদ্যার কথা আলোচনা করা হয়েছে, যাকে বলা হত পর-বিদ্যা। পরবিদ্যা মানে ব্রহ্মবিদ্যা, যা সকল জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কেবলমাত্র এই জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই উপনিষদে বর্ণিত ব্রহ্ম লাভ করা সম্ভব, অন্যথায় নয়।সাধারণত, শিক্ষার্থীর অধ্যয়নের বিষয় ছিল একটি বেদ এবং তার সাথে সম্পর্কিত সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে, তিন বেদের জ্ঞানীকে শ্রোত্রিয় বলা হয়েছে; প্রকৃত জ্ঞান কেবল ত্রয়ী বিদ্যার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।[৩৬] কাঠকসংহিতায় তিনটি বেদের ছাত্রকে ত্রি-শুক্রিয় বলা হয়েছে।[৩৭] কিন্তু মাত্র কয়েকজন ছাত্র তিনটি বেদ অধ্যয়ন করতে পেরেছিল। একজন সাধারণ বৈদিক ছাত্র তার প্রয়োজন অনুসারে শুধুমাত্র একটি বেদ সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করত। প্রায়শই একটি বেদের অধ্যয়নকেও বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করা হত। এই শাখাগুলিও বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। অতএব, বৈদিক-পরবর্তী যুগে বিশেষায়িত শিক্ষার অগ্রগতি অনেক এগিয়েছিল। ফলস্বরূপ, এক বেদের সাথে সম্পর্কিত অনেক ধরণের স্কুল প্রচলিত ছিল।

(৫) বৈদিক শিক্ষাদান পদ্ধতি - (ক) হবন - বৈদিক স্তোত্রগুলির মৌখিক সংরক্ষণের জন্য একটি বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে এই স্তোত্রগুলি যুগ যুগ ধরে শ্রুতি আকারে সংরক্ষিত ছিল।[৩৮] এই সিস্টেমের দুটি রূপ ছিল। প্রথম পদ্ধতিতে, এই মন্ত্রগুলির অর্থ বা আত্মা অর্জিত হয়েছিল। মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। প্রথম পদ্ধতিটি ছিল স্বভাবতই মুখস্থ শেখা। গুরু যখন তাঁর কথা বলা শেষ করতেন, তখনই শিষ্য তাঁর অনুকরণ করে একই কথা পুনরাবৃত্তি করতেন। এই পদ্ধতির ইঙ্গিত ঋগ্বেদের একটি শ্লোকে পাওয়া যায়।[৩৯] মৌখিক পুনরাবৃত্তির এই শিক্ষা একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন অনুসারে পরিচালিত হয়েছিল, যাতে ধ্বনি, শব্দ বা পদগুলি তাদের মূল আকারে উচ্চারিত হয়।

বৈদিক ভাষায় ৫২টি মৌলিক ধ্বনি রয়েছে, যার মধ্যে ১৩টি স্বরবর্ণ এবং ৩৯টি ব্যঞ্জনবর্ণ।[৪০] 'পাদস' সংগঠনের মাধ্যমে প্রথম সাত মিটারে এই সমস্ত শব্দের বিশুদ্ধ রূপের উপর পূর্ণ জোর দেওয়া হয়েছিল। গায়ত্রী, পঙ্‌ক্তি, অনুষ্টুপ বৈদিক মন্ত্রগুলি পরস্পর সংযুক্ত ছিল, হদ এবং পদ ছিল যার পরিমাণ ছিল ভিন্ন। অক্ষর সহ আয়াত। মন্ত্র মুখস্থ করার সময়, শ্লোকের এই সমস্ত অংশের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া হত। ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদের উচ্চারণের তিনটি পদ্ধতি বর্ণনা করে - শব্দের স্বাধীন উচ্চারণ, জোড়া উচ্চারণ এবং ক্রমিক উচ্চারণ।[৪১] পদপাঠেও এই নিয়ম অনুসারে এই একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ধ্বনিগুলিকে ঘোষ, উষ্ম এবং ব্যঞ্জনবর্ণে ভাগ করা হয়েছে। দন্ত এবং অনুনাসিক ধ্বনির মধ্যে ধ্বনিগত পার্থক্যও স্পষ্ট ছিল। তৈত্তিরীয় উপনিষদে, বেদ পাঠের জন্য বর্ণ, স্বর, বালা, সাম এবং সান্তনু (সন্ধি) এর প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 79
Website: https://tirj.org.in, Page No. 667 - 681
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চরিত্র হল স্বরবর্ণ। আয়তন হল বাস। সামা সান্তানুঃ। এটি শিক্ষার অধ্যায়।[৪২] পরবর্তী সাহিত্যেও শুদ্ধ উচ্চারণের গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। 'স্বর' বা 'বর্ণম'-এর অপবিত্রতা দ্বারা দূষিত একটি শব্দের উদ্দেশ্যমূলক অর্থ নেই কারণ এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না। তদুপরি, শব্দের আকারে সেই প্রতারণা পুরোহিতেরও ক্ষতি করে, কারণ কণ্ঠের অপবিত্রতার কারণে বৃত্রাসুর স্বয়ং ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হয়েছিল।

> "মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ।।"[৪৩]

এইভাবে, বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ধ্বনি এবং শব্দের বিশুদ্ধ রূপের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই কারণেই আজও বেশিরভাগ শ্রুতি তাদের ভৌত আকারে পাওয়া যায়।

(খ) মন্ত্রের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি বোঝার জন্য, শিষ্যকে আরেকটি ধ্যান করতে হবে। প্রক্রিয়াটি অনুশীলন করতে হয়েছিল। এই প্রক্রিয়াটি ছিল ধ্যান। ধ্যানের মাধ্যমে শিষ্য প্রতিটি শব্দ, মন্ত্র এবং শ্লোকের অর্থ বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। গুরুর সাহায্যে, তিনি সেই আধ্যাত্মিক উপাদানগুলির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন যার আত্মা মন্ত্রগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই অভিজ্ঞতা কেবল গুরুর শিক্ষার মাধ্যমে সম্ভব ছিল না। এর জন্য শিষ্যকে 'স্বাধ্যায়' অনুশীলন করতে হয়েছিল। 'ব্রতচারী' হয়ে তিনি কঠোর ধ্যানে লিপ্ত হন। বহির্বিশ্ব থেকে তাঁর সমস্ত চিন্তাভাবনা প্রত্যাহার করে, তিনি সেগুলিকে সর্বোচ্চ জ্ঞানের উপর কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। শিষ্যের এই আধ্যাত্মিক অনুশীলনকে ব্যাঙের গভীর ঘুমের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যেখানে সে বাইরের জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকে। বর্ষা শুরু হওয়ার সাথে সাথে ব্যাঙের ঘুম ভেঙে যায় এবং সে ডাকতে শুরু করে। একইভাবে, বৈদিক ছাত্ররা তাদের আধ্যাত্মিক সাধনা সম্পন্ন করার পর, এক নতুন আলোয় অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষক হিসেবে মন্ত্র শিক্ষায় নিযুক্ত হতে দেখা যেত।[৪৪] এই জ্ঞান ছিল একেবারে স্বাভাবিক। গুরুর শিক্ষা ছিল জ্ঞান অর্জনের দিকে কেবল ইঙ্গিত। কেবল মন্ত্র মুখস্থ করে শিষ্যের কাজ সম্পন্ন করা যেত না। বৈদিক সাহিত্যে, অর্থহীন বাহ্যিক জ্ঞানকে নিন্দনীয় বলে মনে করা হয়। "স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাদৃভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থম্।"[৪৫] যেসব ছাত্র কেবল মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করতে শিখেছে তাদের ঋগ্বেদে অরবাক্ বলা হয়।[৪৬]

(গ) **নিদিধ্যাসন** - নিদিধ্যাসন দ্বারা, শিক্ষার্থী স্ব-অনুভূত জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে অবশেষে তার নিজের চিরন্তন আলোকিত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, সর্বত্র সচ্চিদানন্দকে অনুভব করে, জীবনমুক্তির আনন্দ উপভোগ করে এবং ব্রহ্মের অনন্য চিন্ময় সত্তায় প্রবেশ করে - "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সদ্ ব্রহ্মাপ্যেতি। তার জীবনীশক্তি তাকে ত্যাগ করে না, যেমন ব্রাহ্মণ সদ ব্রহ্মকে ত্যাগ করে না।[৪৭] এটাই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য, এটাই জ্ঞানের অর্থ এবং এটাই শিক্ষার লক্ষ্য। উপনিষদে এই তিনটি প্রক্রিয়াকে নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে - শ্রাবণম তু গুরোঃ মননং তদন্তরম্। নিদিধ্যাসনমিত্যেতৎপূর্ণবোধস্য কারণম্।।[৪৮] এই ধ্যান সম্পূর্ণ জ্ঞানের কারণ।

(ঘ) **উপনয়ন** - বৈদিক শিক্ষা সাধারণত উপনয়ন অনুষ্ঠানের পরে শুরু হত।[৪৯] এই প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদে অনেক জায়গায় এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৫০] শুরুতে, উপনয়ন করা বাধ্যতামূলক ছিল না। বেশিরভাগ মানুষ উপনয়ন ছাড়াই পড়াশুনা শুরু করত।[৫১] পরবর্তী বৈদিক যুগে উপনয়নের গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সূত্র যুগে দ্বিজদের জন্য এই আচার বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছিল। উপনয়ন অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বর্ণনা অথর্ববেদে পাওয়া যায়। এই অনুষ্ঠানের পরেই আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হয় এবং ব্যক্তিকে 'দ্বিজ' উপাধি দেওয়া হয়। বাবা-মা তাকে কেবল শারীরিক জন্ম দিয়েছিলেন। তার উপনয়ন অনুষ্ঠানের পর তিনি ব্রহ্মচারী হবেন এবং ব্রহ্মচারী হিসেবে নতুন জীবন শুরু করবেনন - "উপনয়নো ব্রহ্মচারিণং কৃণুতে গর্ভয়ন্তঃ।"

বিবাহ অনুষ্ঠানটি একজন ব্রহ্মচারী মহিলা দ্বারা সঞ্চালিত হয় যিনি গর্ভবতী হন। এই আচারটি তিন রাত ধরে করা হয়েছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদে এর পদ্ধতি এবং গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৫২] উপনয়নের আকাঙ্ক্ষায়, শিষ্য অত্যন্ত বিনয়ের সাথে গুরুর সামনে উপস্থিত হতেন, হাতে সমিধ ধারণ করে এবং প্রার্থনা করতেন - হে প্রভু! আমাকে ব্রহ্মচারী করো।[৫৩] গুরু তাকে তার নাম এবং বংশ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। উত্তরে সন্তুষ্ট হওয়ার পর, তিনি দর্শনার্থীকে তার শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করার জন্য নিজেকে উপস্থাপন করতেন। তিনি সম্ভাব্য শিষ্যের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 79
Website: https://tirj.org.in, Page No. 667 - 681
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মাথায় হাত রাখতেন এবং তাকে তার সুরক্ষা প্রদান করতেন। সাবিত্রীর শিক্ষার মাধ্যমে, তিনি ব্রহ্মচর্য আশ্রমে প্রবেশ করতেন। প্রথম দিনে, শিষ্যকে গুরু (দশ গরমি ভবতি) দ্বারা আধ্যাত্মিকভাবে গর্ভধারণ করা হত। তৃতীয় রাতে, শিষ্য পুনর্জন্ম লাভ করত।

(ঙ) **শিক্ষার সময়কাল** - শিক্ষার সময়কাল বিষয়বস্তুর পরিমাণের উপর নির্ভর করে। গৌতম ধর্মসূত্র অনুসারে, যেকোনো একটি বেদের সম্পূর্ণ অধ্যয়নের সময়কাল ১২ বছর।[৫৪] সময় প্রত্যাশিত ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি দ্বারাও এটি নিশ্চিত করা হয়েছে – 'প্রতিটি বেদের জন্য, বারো বা পাঁচ বছরের ব্রহ্মচর্যের সময়কাল থাকে, তবে শিক্ষার শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য নির্ধারিত থাকে।[৫৫] এইভাবে, চারটি বেদের জন্য ৫৮ বছর প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়েছিল। বেশিরভাগ ছাত্র ১২ বছর ধরে একটি বেদ অধ্যয়ন শেষ করে বাড়ি ফিরে যেত। মেগাস্থেনিসের বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, ভারতীয় ছাত্রদের ৩৬ বছর ধরে পড়াশোনা করতে দেখা গেছে। বোধায়ন ধর্মসূত্র অনুসারে, শিক্ষার্থীর চুল সাদা না হওয়া পর্যন্ত বৈদিক শিক্ষা চলতে পারে।[৫৬] যারা শিক্ষক বা বিশেষজ্ঞ হতে চান তারা হয়তো এটা করতে পারেন।

(গ) **শাস্তি** - প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় শাস্তি ছিল আধ্যাত্মিক। আপস্তম্বের মতে, শিক্ষকের উচিত হয় আপত্তিকর ছাত্রকে তার দৃষ্টির সামনে থেকে সরিয়ে দেওয়া অথবা তাকে উপবাস করার নির্দেশ দেওয়া। স্পষ্টতই আপস্তম্ব কোনও ধরণের শারীরিক শাস্তি কল্পনা করেন না।[৫৭] মনুও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপাস্তম্বের সাথে একমত।[৫৮] গৌতম মৃদু শারীরিক শাস্তিরও অনুমতি দেন, কিন্তু স্পষ্ট করে বলেন যে, যেসব শিক্ষক কঠোর শাস্তি দেন, তাদের রাজার দ্বারা শাস্তি দেওয়া উচিত।শিষ্যের অনুশাসনকে হত্যা করে। সে দড়ি আর বাঁশি ধরতে পারছিল না। অন্যের দ্বারা হত্যা এবং রাজা দ্বারা শাসিত।[৫৯]

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে মৃদু শারীরিক শাস্তির এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। বেনারসের এক রাজপুত্রকে তক্ষশীলার এক শিক্ষক এইভাবে শাস্তি দিয়েছিলেন। এই রাজপুত্র চুরির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল, যা শিক্ষকের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সে ত্যাগ করতে পারেনি। উক্ত শিক্ষকের মতে, তার পক্ষে শাস্তি বা লাঠি ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না- "অরিয়ো অনরিয়ং কুর্বানং দণ্ডেন নিসেধতি। সাসনত্থং না তং বেরং ইতি ন পণ্ডিতা বিন্দু।।"[৬০]

বিষ্ণুও শারীরিক শাস্তির পক্ষে ছিলেন এবং সময়ে সময়ে এর ব্যবহার প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। শ্রী অলটেকারের মতে, মনু এবং আপস্তম্বের আদেশ অনুসারে প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যালয়গুলিতে প্রায়শই হালকা শারীরিক শাস্তি দেওয়া হত।[৬১] কিন্তু এই শাস্তি কোনওভাবেই কঠোর বা অমানবিক ছিল না। স্কুল জীবন সাধারণত মসৃণ এবং স্নেহপূর্ণ ছিল। শিক্ষিত এবং শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্কের আদর্শ এতটাই উচ্চ ছিল যে শৃঙ্খলা ভঙ্গের সম্ভাবনা খুব কম ছিল।[৬২]

(৬) **শিক্ষা কর্মকর্তা** - মনুস্মৃতি অধ্যয়ন থেকে জানা যায় যে, কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যরাই শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। এই তিন বছর শূদ্রদের কেবল কোনও অভিযোগ ছাড়াই সেবা করতে হয়েছিল, এটাই ছিল তার একমাত্র অধিকার।[৬৩] ডঃ আলতেকারের মতে, শূদ্রদের বৈদিক শিক্ষা দরজা বন্ধ ছিল।[৬৪] অধ্যপনার অধিকার কেবল ব্রাহ্মণদেরই ছিল। তবে, ঋগ্বেদের সময় কেবল ব্রাহ্মণরাই উচ্চশিক্ষার অধিকারী ছিলেন না। অন্যান্য বর্ণের লোকেরাও উচ্চশিক্ষা পেতে পারত।

ঋগ্বেদে আমরা এমন একটি পরিবারের বর্ণনা পাই যেখানে পিতা ছিলেন একজন চিকিৎসক, পুত্র ছিলেন বৈদিক কবি এবং মা ছিলেন একজন শস্য পেষণকারী শ্রমিক। এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে একই পরিবারের সদস্যরা বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন এবং অন্যান্য পেশায়ও নিযুক্ত হতে পারতেন।[৬৫] ঋগ্বৈদিক ঋষিরাও ক্ষত্রিয় বা রাজন্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অম্বরীশ, ত্রাসাদাস্যু, অশ্বমেব ইত্যাদি উদাহরণ (ঋগ্বেদ, ১/১০০/১৭)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রবর্তক মহিদাস ছিলেন একজন শূদ্র মায়ের পুত্র। ঋষি কাভাপ আইলুপ একজন দাসীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। স্বর্য্য বদরায়ণ বেদব্যাস যিনি বেদ সংকলন ও সম্পাদনা করেছিলেন, তিনি ছিলেন একজন জেলে কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণকারী একজন আর্য ঋষির পুত্র।[৬৬]

বাজসনেয়ী সংহিতায়[৬৭] চারটি বর্ণকেই বৈদিক শিক্ষার অধিকারী বলা হয়েছে। এই চার বছর ছাড়াও, নিষাদ জাতি, যারা স্পষ্টতই অনার্য ছিল, তাদেরও যজ্ঞ করার অধিকার ছিল।[৬৮] ঋগ্বেদ (১০/৪৫/৬) অনুসারে, পাঁচ বর্ণের মানুষ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 79
Website: https://tirj.org.in, Page No. 667 - 681
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অগ্নিহোত্রে (জনা যদাগ্নিম্ অয়জন্ত পঞ্চ) অংশগ্রহণ করেছিলেন। যাস্কের সংজ্ঞায়, এই পাঁচ বর্ণকে নিষাদ জাতিকে অনার্যদের সাথে অন্তর্ভুক্ত করে।[৬৯] শান্তনুর ভাই দেবাপি সিংহাসনচ্যুত হওয়ার পর, পুরোহিতত্বে দক্ষতা অর্জন করেন এবং শান্তনুর স্থানে যজ্ঞ করেন।[৭০] রাজসূয় যজ্ঞের রত্নবিষীতে (রত্ন নিবেদন) বৈশ্য ও শূদ্রদের স্থান ছিল।[৭১] অনেক ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণ জ্ঞানে ব্রাহ্মণদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। রাজা জনক-এর পাণ্ডিত্য এবং তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান সর্বত্র সুপরিচিত ছিল। এমনকি গার্গ্য এবং বালকির মতো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরও কাশীর ক্ষত্রিয় রাজা অজাতশত্রুর পাণ্ডিত্য স্বীকার করতে হয়েছিল।[৭২] পাঞ্চালের প্রহরণ জয়বল এবং কেকয়ের অশ্বামিত্রও দর্শনের মহান পণ্ডিত ছিলেন। পঞ্চালদেশী সভায় ক্ষত্রিয় রাজা প্রবাহরণের একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারেননি শ্বেতকেতু। এমনকি শ্বেতকেতুর বাবা আরুণিও এই প্রশ্নের উত্তর জানতেন না। অতএব, তাকে জাবালির কাছে যেতে হয়েছিল এবং তার শিষ্য হতে হয়েছিল।[৭৩] গর্গের প্রপৌত্র চিত্রাও একজন ক্ষত্রিয় মহাত্মা।

তিনি ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যার ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞান সর্বোচ্চ স্তরের ছিল।[৭৪] আরুণিও তাঁর শিষ্য হন। উপনিষদের অধ্যয়ন থেকে আরও জানা যায় যে, ক্ষত্রিয় রাজারা প্রথম ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আরুণিকে তাঁর শিষ্য করার সময়, প্রবাহরন জয়ওয়াল বলেছিলেন – 'পূর্বে এই জ্ঞান (ব্রহ্মবিদ্যা) কোনও ব্রাহ্মণের কাছে ছিল না।' কিন্তু এই ধরণের ক্ষত্রিয় জ্ঞানী রাজার সংখ্যা সীমিত ছিল। ক্ষত্রিয়দের অধ্যয়নের বিষয়গুলি সাধারণত রাষ্ট্রীয় বিষয়, যুদ্ধ-কৌশল এবং তীরন্দাজবিদ্যার সাথে সম্পর্কিত ছিল। তারা এই বিষয়গুলিতে বেশিরভাগই ব্রাহ্মণ শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা পেত। বৈশ্যদের প্রধান কাজ ছিল ভূমি সম্পর্কিত। সমাধান ছিল তার 'জীবন-মৃত্যুর লক্ষ্য'।[৭৫] তাদের প্রধান কাজ ছিল কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পের সাথে সম্পর্কিত। ফলস্বরূপ, তার শিক্ষা এই বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত ছিল। তারা সম্ভবত দেশের বৌদ্ধিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করত না।[৭৬] 'বণিনৃ' শব্দটি ঋগ্বেদেও ব্যবহৃত হয়েছে।[৭৭] শূদ্রদের মর্যাদা খুবই নিম্ন ছিল, তবুও তাদের শ্রম জমি চাষ, মাড়াই, পশুপালন, হস্তশিল্প ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হত। শূদ্র জাতির লোকেরা সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র (দেবজন বিদ্যা) ইত্যাদিতে বেশি আগ্রহী ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে, ব্রাহ্মণ শিক্ষকরা শারীরিক বিষয় পড়াতেন বলে জানা গেছে। এই শিক্ষকদের শিষ্যদের মধ্যে বৈশ্য, জেলে, সর্পযাত্রী, শিকারী ইত্যাদি পেশাদার ব্যক্তিও ছিলেন।[৭৮]

(৭) **শিক্ষা কেন্দ্র** - বৈদিক মন্ত্র সংরক্ষণের জন্য, প্রতিটি বৈদিক ঋষি তার পুত্রদের মৌখিক শিক্ষা দিতেন।[৭৯] ফলস্বরূপ, প্রাথমিক বৈদিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি বেশিরভাগই পারিবারিক বিদ্যালয় ছিল, যেখানে ঋষিদের পুত্ররা মৌখিক জ্ঞান অর্জন করতেন। সময়ের সাথে সাথে, ধর্মীয় বলিদানের ধরণ জটিল হয়ে ওঠে এবং মন্ত্রগুলির অর্থ বোধগম্য হয়ে ওঠে। তাই, ঋষিদের পুত্রদের পাশাপাশি, অন্যান্য ছাত্ররাও ঋগ্বেদিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে শুরু করে এবং গুরুকুলের বৃত্ত ধীরে ধীরে প্রসারিত হতে থাকে।[৮০] কিন্তু স্কুলটি সর্বদা একটি ব্যক্তিগত গুরুকুল ছিল, এটি কখনও একটি ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের রূপ নেয়নি। গুরুর আশ্রম ছিল সেই স্কুল যেখানে শিষ্য গুরু পরিবারের একজন অবিচ্ছেদ্য সদস্য হিসেবে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করতেন। এই শিক্ষা জীবনের সাথে সম্পর্কহীন ছিল না। প্রাচীন ছাত্র জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদনের সাথে সাথে জ্ঞান অর্জনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিল। তিনি গুরুর আশ্রমে সামাজিক দায়বদ্ধতার মৌলিক শিক্ষাও লাভ করেন।

(ক) ব্রাহ্মণ সংঘ - উচ্চতর জ্ঞানের গবেষণা ও প্রচারের জন্য ঋগ্বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ সংঘ নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৈদিক বিদ্যালয়ের সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীরা তাদের স্ব-অধ্যয়ন সমাপ্তির পরে এই সমিতিগুলিতে সমবেত হত। এখানে, পারস্পরিক মতামত বিনিময় এবং বিতর্কের মাধ্যমে, গভীর আধ্যাত্মিক উপাদানগুলি উন্মোচিত হয়েছিল এবং নতুন তথ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। সংঘের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন ও প্রচারের ব্যবস্থা ভারতেই উদ্ভাবিত হয়েছিল।[৮১] এই সমিতিগুলিতে একটি আধুনিক সেমিনারির সমস্ত বৈশিষ্ট্য ছিল। এইভাবে, ভারতীয় শিক্ষাজগৎ বৈদিক যুগে 'সেমিনার'-এর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগে, শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যা শাখা, মঞ্চ, পরিষদ, বংশ এবং গোত্র নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 79
Website: https://tirj.org.in, Page No. 667 - 681
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

(খ) শাখা - 'শাখা' শব্দটি একই বেদ (মূল বৃক্ষ) থেকে উৎপন্ন তিনটি বেদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। বলা হয় যে সায়নাচার্য বেদের তিনটি শাখার উপর ভাষ্য লিখেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে, 'শাখা' শব্দটি তিনটি বেদের বিভিন্ন রূপকে বোঝাতে শুরু করে, যা বিভিন্ন ঋষিকুলে মূল রূপের পরিবর্তিত সংস্করণ ছিল। মৌখিক সংরক্ষণের কারণে, বেদের মূল রূপে কিছু পরিবর্তন অনিবার্য ছিল। কোথাও উচ্চারণ বদলে গেছে, কোথাও পুরনো মন্ত্র বাদ পড়েছে, কোথাও নতুন মন্ত্র যুক্ত হয়েছে, কোথাও এই সব ঘটনা একই সাথে ঘটেছে। এইভাবে বিভিন্ন বংশে বেদের বিভিন্ন কপি সংরক্ষিত হয়েছিল। প্রতিটি বংশ একটি স্বাধীন শাখা হিসেবে নিজস্ব অনুকরণ সংরক্ষণ এবং প্রচারে নিযুক্ত হয়ে ওঠে। এই শাখাগুলি কেবল বেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ব্রাহ্মণদের অনেক শাখাও তাদের সাথে সম্পর্কিত ছিল।

(গ) পর্যায় - শাখা এবং পর্যায় প্রায়শই সমার্থক হিসাবে বিবেচিত হয়। এই দুটি ভিন্ন ছিল। পাণিনির মতে[৮২] - একদল লোক ছিল যারা চরণ শাখা অধ্যয়ন করত অথবা প্রকৃতপক্ষে এর অনুসারী ছিল। জগধরের মালতীমাধব ভাষ্যেও চরণের প্রায় একই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে – 'যারা বেদের একটি নির্দিষ্ট শাখা অধ্যয়ন করেন এবং এই ধরণের পাঠকদের একটি দল গঠন করেন, তারাই চরণ।' এইভাবে 'শাখা' শব্দটি বেদ এবং ব্রাহ্মণদের একটি নির্দিষ্ট রূপকে নির্দেশ করে। এই বিশেষ শাখার অনুসারীদের জন্য 'চরণ' শব্দটি ব্যবহৃত হত। সূত্র যুগের 'চর্যাণব্যূহ' নামক গ্রন্থে ঋগ্বেদের পাঁচটি পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে - শাকাল, বশকাল, অশ্বলায়ন, শাখায়ন ও মদুকেয়। এই তালিকায় অনেক পুরনো মঞ্চের নাম অনুপস্থিত। পাণিনির সময়ে বেদের ২৪টি অংশ বিখ্যাত ছিল। যাদের নাম আমার সূত্রে এখানে সেখানে দেওয়া আছে।[৮৩]

(ঘ) পরিষদ - 'পরিষদ' আক্ষরিক অর্থ 'বসা'? উপনিষদে, এই শব্দটি দার্শনিক প্রশ্নগুলির উপর আলোচনাকারী পণ্ডিতদের সমাবেশের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তারা মতবিনিময়ের জন্য জড়ো হত। সময়ের সাথে সাথে, পরিষদ স্বাভাবিকভাবেই এমন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে যেখানে বিদ্বান ব্রাহ্মণরা প্রচুর সংখ্যায় বাস করতেন। উন্নত সাংস্কৃতিক সমাবেশগুলি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয় যা সর্বোচ্চ দার্শনিক তথ্য নির্ধারণ করে এবং উচ্চতর জ্ঞানের শিক্ষা প্রদান করে। আধুনিক পরিভাষায় এই পরিষদকে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে যেখানে বিভিন্ন কলেজের (পর্যায়ের) শিক্ষার্থীরা উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করে।[৮৪] বৈদিক-পরবর্তী যুগে, পরিষদের মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছিল। উত্তরপথের পাঞ্চাল পরিষদ ছিল একটি অত্যন্ত বিখ্যাত সমাবেশ। প্রবাহন নিয়মিতভাবে জয়াবলি কাউন্সিলে অংশগ্রহণ করতেন। শ্বেতাকেতু এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না।[৮৫]

(ঙ) গোত্র বা **কুল** - বেদের বিভিন্ন শাখা ছিল এবং পর্যায়গুলি কেবল ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু গোত্রটি বংশের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল, যা বাস্তব বা কাল্পনিক হতে পারে। প্রাচীন মন্ত্রদর্শী ঋষিদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বংশ বা গোত্র ছিল। প্রতিটি বংশের সদস্যরা নিজেদেরকে একটি নির্দিষ্ট ঋষির বংশধর বলে মনে করতেন এবং এই বংশগুলিতে সেই নির্দিষ্ট ঋষির শিক্ষা ব্যবস্থা এবং রীতিনীতি প্রচলিত ছিল। আজও গোত্র ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বর্ণের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত সম্পদ এবং ধর্মীয় কার্যকলাপে এটি বিবেচনা করা হয়। সকল ব্রাহ্মণকে সাতজন ঋষির বংশধর বলা হয় - ভৃগু, অঙ্গিরা, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অত্রি, অগস্ত্য। কিন্তু প্রকৃত পূর্বপুরুষরা হলেন আটজন – জমদগ্নি, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, বসিষ্ঠ, অত্রি, কাশ্যপ, অগস্ত্য। এই আটটি গোত্রকে ৪৯টি উপ-গোত্রে বিভক্ত করা হয়েছিল, যা পরবর্তীতে আরও কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়েছিল, যেগুলিকে আসলে পরিবার বলা যেতে পারে।[৮৬]

(৮) **শিক্ষকের স্থান (গুরু বা ঋষি)** - মনন ও ধ্যানের স্ব-অধ্যয়ন প্রক্রিয়া শুরু করার আগে গুরুর শিক্ষা মনোযোগ সহকারে শোনা অপরিহার্য বলে মনে করা হয়। বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থায়, শিক্ষক অতিপ্রাকৃত মহিমা উপভোগ করেন - "ন নরেণাবরেণ প্রোক্তং এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ। অনন্যপ্রোক্ত গতিরত্র নাস্তি অণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ।।[৮৭]

এটি ভালভাবে বোঝা যায় এবং এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা অনেক উপায়ে চিন্তা করা হয়েছে যিনি এটির কথা বলেননি এখানে একচেটিয়াভাবে বলা হয়েছে এমন কোনও নড়াচড়া নেই, কারণ এটি একটি পরমাণুর পরিমাপের চেয়ে নিকৃষ্ট। আত্মার বিষয়টি এতটাই গভীর যে, যদি না এমন একজন শিক্ষক খুঁজে পাওয়া যায় যিনি এটিকে তার প্রকৃত রূপে ব্যাখ্যা করতে পারেন, তাহলে কোনও কৌতূহলী শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীর পক্ষে এটি সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করা অসম্ভব।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 79
Website: https://tirj.org.in, Page No. 667 - 681
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এছাড়াও, যে ব্যক্তি গুরুর শিক্ষা গ্রহণ না করে নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা নিয়ে গর্বিত, সে একজন অন্ধের মতো, যাকে অন্য একজন অন্ধ নেতৃত্ব দিচ্ছে। "অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ। জঙ্ঘন্ধ্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।।"[৮৮] অর্থাৎ যারা অজ্ঞতার মাঝে থাকে তারা আত্মনিয়ন্ত্রিত হয় এবং নিজেদেরকে বিদগ্ধ বলে মনে করে মূর্খরা অন্ধদের দ্বারা বিপথে পরিচালিত হয় যেমন অন্ধদের দ্বারা অন্ধের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। অতএব, পরম জ্ঞান অর্জনের জন্য, সাধককে অবশ্যই একজন ঈশ্বর-ভক্ত সদগুরুর আশ্রয় নিতে হবে - "তদ্ধি জ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মোনিষ্টম্।।"[৮৯] অর্থাৎ সেই জ্ঞানের জন্য তাকে আধ্যাত্মিক গুরুর কাছে যেতে হবে। যজ্ঞকারী অগ্নি বাহক একজন শ্রোত্রিয় এবং ব্রাহ্মণের ভক্ত।

মৈত্রায়ণ উপনিষদে, পুত্র বা শিষ্য ছাড়া অন্য কাউকে সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী বলে মনে করা হয় না। এটাও বলা হয় যে সর্বোচ্চ জ্ঞানের শিক্ষা কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিকেই দেওয়া উচিত যিনি যোগ্য এবং শিক্ষকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখেন।[৯০]

শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত গুরু (শিক্ষক) এর সন্ধানে দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করত এবং বিখ্যাত শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করত। তৈত্তিরীয়োপনিষদে এটি নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে - "যথাSSপঃ প্রবহতা যন্তি যথা মাসা অহর্জরম্। এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।।"[৯১] জল যেমন প্রবাহিত হয় এবং প্রবাহিত হয়, তেমনি মাস ও দিনও প্রবাহিত হয়। এইভাবে ব্রহ্মচারীরা আমাকে সব দিক থেকে রক্ষাকরুক। যেমন সমস্ত জলধারা নীচের দিকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে মিশে যায় এবং যেমন মাস এবং দিনগুলি সংবৎসরের আকারে শেষ হয়ে সময়ের মধ্যে চলে যায়, হে সৃষ্টিকর্তা, তেমনি ব্রহ্মচারী লোকেরা সকল দিক থেকে আমার কাছে আসুক।'

'তৈত্তিরোপনিষদেও'[৯২] শিক্ষকদের দেবতাতুল্য (আচার্যদেব ভাব) মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, আত্ম-জ্ঞান কেবল গুরুর কৃপায়ই লাভ করা যায়। "প্রভু ঈশ্বরের কৃপায়ের ভিত্তি হল গুরুর কৃপা। গুরুর কৃপা ছাড়া পরমেশ্বরের কৃপা নেই এবং প্রভুর কৃপা ছাড়া কেউ প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারে না।" একজন গুরুর মর্যাদা এর চেয়ে বেশি মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। শ্বেতাশ্বরী উপনিষদ স্পষ্টভাবে বলে - "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তুনুং স্বাম্।"[৯৩] অর্থাৎ সে যা চায় তা তার কাছে পাওয়া যায় এবং এই আত্মা তার কাছে নিজেকে প্রকাশ করে। ঈশ্বরের আশীর্বাদপ্রাপ্ত ব্যক্তিই কেবল তাঁকে গ্রহণ করে। কিন্তু উপনিষদে দেবতাতুল্য গুরুর সংজ্ঞাও খুব কঠোর রাখা হয়েছে। কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই গুরু হওয়ার যোগ্য যিনি ব্রহ্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেছেন। গুরুর বৈশিষ্ট্য এই বিষয়ে উপনিষদের স্পষ্ট নির্দেশনা এখানে দেওয়া হল - "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মোনিষ্টম্।[৯৪]

এটা বোঝার জন্য, তার আধ্যাত্মিক গুরুকে খোঁজা উচিত, যিনি একজন শ্রোত্রিয়, যিনি পরম সত্যের প্রতি নিবেদিত, হাতে আগুন ধরে রেখেছেন। তত্ত্বজ্ঞান কেবলমাত্র 'শ্রোত্রিয়, অর্থাৎ বেদের অর্থের জ্ঞাতা এবং একনিষ্ঠ জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী গুরু' দ্বারাই লাভ করা যায় - "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।"[৯৫] অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি সর্বোচ্চ ভক্তি রাখে সে তার আধ্যাত্মিক গুরুর মতোই ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত। মহান আত্মা দ্বারা বর্ণিত এই অর্থগুলি প্রকাশিত হয়। এই রহস্যময় অর্থগুলি সেই মহান আত্মার হৃদয়ে প্রকাশিত হয় যার পরমেশ্বর ঈশ্বরের প্রতি এবং একইভাবে তাঁর গুরুর প্রতি ভক্তি রয়েছে। এমন জ্ঞানী গুরুকে খুশি করার এবং তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার নির্দেশও ভগবদগীতায় দেওয়া হয়েছে - "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।[৯৬]

গুরু-দক্ষিণা - প্রণাম করে, প্রশ্ন করে এবং পরিবেশন করে জেনে নিন। জ্ঞানীরা যারা সত্য দেখেছেন তারা তাদের জ্ঞান শেখাবেন। বৈদিক জ্ঞান সংরক্ষণ ও সঞ্চালনে নিয়োজিত শিক্ষকরা আসলে ঋষিদের দ্বারা অর্পিত দায়িত্ব পালন করছিলেন। শিক্ষা প্রদানের এই আধ্যাত্মিক বা নৈতিক পদ্ধতিতে, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সংমিশ্রণে কোনও নগদ সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ ছিল না। গুরুর বাড়িতে একজন শিষ্যের আগমন আসলে তার পরিবারে একটি সংযোজন ছিল, ঠিক যেমন একটি নবজাতক পুত্রের আগমন।' ফলস্বরূপ, একজন শিষ্যের আগমন গুরুর দায়িত্ব বৃদ্ধি করে, আর্থিক আয় নয়। যেসব শিক্ষক ফি দিয়ে শিক্ষা প্রদান করেন তাদের বলা হয় পায়ি (উপপাতকি)।[৯৭] স্মৃতি-চন্দ্রিকায়, শিষ্যত্বের জন্য শিক্ষক কর্তৃক যেকোনো

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 79
Website: https://tirj.org.in, Page No. 667 - 681
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পারিশ্রমিকের প্রস্তাবকেও নিন্দনীয় বলে মনে করা হয়।[৯৮] কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রে জ্ঞান ক্রয়-বিক্রয়ের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে - "যস্যাগমঃ কেবলজীবিকায়ৈ তং জ্ঞানপণ্যং বাণিজ্যং বদন্তি।"[৯৯] যে ব্যক্তির আয় শুধুমাত্র জীবিকা নির্বাহের জন্য তাকে 'বণিক' বলা হয় যে জ্ঞান বিক্রি করে। কিন্তু শিক্ষা সমাপ্তির পর, গুরুর শিষ্যের কাছ থেকে উপযুক্ত দক্ষিণা গ্রহণের অধিকার ছিল। মনুর মতে, সংবর্তনের পরে, শিষ্যকে তার শক্তি অনুসারে কাজ করতে হতো।উপযুক্ত জিনিসপত্র গুরুকে উৎসর্গ করে উপলব্ধ করা উচিত। দক্ষিণার জিনিসপত্র হতে পারে গরু, ঘোড়া, জুতা, বসার জিনিসপত্র, খাদ্যশস্য এমনকি শাকসবজিও।[১০০] কখনও কখনও, ছাত্রদের তাদের গুরুকে দক্ষিণা দিতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হত। কালিদাসের রঘুবংশ (পঞ্চম স্কন্ধ)-এ কৌৎসের উল্লেখ আছে যিনি রাজা রঘুর কাছে গুরুদক্ষিণা চেয়েছিলেন। রঘুর উত্তর দেখার মতো - "গুর্বর্থমর্থী শ্রুতপারদৃশ্বা রঘোঃ সকাশাদনবাপ্যকামম্। গতো বদান্যান্তরমিত্যয়ং মে মাভূৎপরীবাদনবাবতারঃ।।[১০১] তাঁর আধ্যাত্মিক গুরুর মঙ্গল কামনা করে তিনি শুনেছিলেন এবং দেখেছিলেন যে তিনি রঘুর উপস্থিতিতে তা অর্জন করতে পারেননি। আমি উদারতার অন্য দিকে চলে গেছি, তাই আমার এই নতুন অবতারকে পরিয়া হতে দিও না। মহাভারতে, রাজা পোষ্য তার স্ত্রীকে তার মূল্যবান কানের দুল উত্তঙ্ককে দিতে আদেশ দেন যাতে তিনি তা তার গুরুকে দক্ষিণা হিসেবে দিতে পারেন। উত্তঙ্কের গুরু স্ত্রীর কানের দুল পরার তীব্র ইচ্ছা ছিল। প্রকৃতপক্ষে, দক্ষিণা হিসেবে চাওয়া যেকোনো জিনিস প্রত্যাখ্যান করাকে একটি ঘৃণ্য কাজ বলে মনে করা হত।

নীতিগতভাবে, দক্ষিণা কেবল পড়াশোনা শেষ করার পরেই দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে, ধনী ছাত্ররা শুরুতেই দক্ষিণা দিতেন। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায়ও এই ধরণের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১০২] মিলিন্দা প্রশ্নে, নাগসেনের বাবা ইতিমধ্যেই তার ছেলের শিক্ষার খরচ পরিশোধ করে ফেলেছিলেন। ইন্দো-গ্রীক রাজা মিলিন্দও তাঁর গুরু, সন্ন্যাসী নাগসেনকে তাঁর শিক্ষা শুরু করার আগে একটি মূল্যবান দক্ষিণা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নাগসেন যখন তা প্রত্যাখ্যান করেন, তখন মিলিন্দ তাঁকে তা গ্রহণ করার জন্য জোর দেন যাতে তিনি বিনামূল্যে তা দেওয়ার জন্য দোষী না হন। এইভাবে, প্রাচীন ভারতে, শিক্ষা গ্রহণের জন্য ফি প্রদান বাধ্যতামূলক ছিল না। অতএব, সম্পদহীন শিশুদের জন্য শিক্ষা অর্জন যতটা সহজ ছিল, ততটাই ধনী শিক্ষার্থীদের জন্যও ছিল।[১০৩]

প্রাচীনকালে, শিক্ষকতা এতটাই মর্যাদাপূর্ণ পেশা হিসেবে বিবেচিত হত যে পৃথিবীর কোনও কিছুই একজন শিক্ষককে সন্তুষ্ট করার মতো মূল্যবান ছিল না। কিছুই যথেষ্ট ছিল না। আসলে, একজন শিক্ষককে এমনকি একটি বর্ণমালার জ্ঞান প্রদানের এজন্যও সমগ্র বিশ্বের অর্থের প্রয়োজন - "একমপ্যক্ষরং যস্তুগুরুঃ শিষ্যেনিবেদয়েৎ। পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দৃত্বা চাণৃণী ভবেৎ।।"[১০৪] অর্থাৎ একজন শিক্ষক যিনি একজন শিষ্যকে এমনকি একটি শব্দাংশও দেন, পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা এত ঐশ্বরিক যে কেউ তা দিতে পারে এবং ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারে। ভারতীয় বিচারক মনে করেন যে, অর্থাভাবের কারণে কোনো শিক্ষক যেন তাঁর বৃত্তি বা পেশা না ছেড়ে দেন। কোন ছাত্র পড়াশোনা যেন না ছাড়ে এই অর্থাভাবে। স্মৃতিগুলোর উদ্দেশ্যে ছিল সকলকে পড়াশোনার সাথে যুক্ত রাখা।[১০৫]

Reference:

১. ড. আর কে. মুখার্জী : প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা, প্রস্তাবনা-v-vi
২. উপনিষদ গ্রন্থাবলী, গ্রন্থিক, ছান্দোগ্য উপনিষদ -৩/১৪/১
৩. তদেব, -৩/৮/৭
৪. আর.কে. মুখার্জি: প্রাগুক্ত -প্রস্তাবনা-XXIV
৫. শ্রীমদ্ভগবদগীতা -১০/৩২
৬. তদেব, -১৮/৪৫
৭. তদেব-১৬/২৩-২৪
৮. পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু: ডিসকভারি অফ্ ইণ্ডিয়া, পৃ. ৭৩
৯. প্রাগুক্ত, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা, প্রস্তাবনা-XXXV।

১০. প্রাগুক্ত, শুকরহসস্যোপনিষদ, -৩/১৩
১১. প্রাগুক্ত, মুণ্ডকোপনিষদ, -১/২/১২
১২. প্রাগুক্ত ছান্দোগ্য-উপনিষদ- ৮/৭/১-৩
১৩. কৌষিতকী ব্রাহ্মণ, উ-১/১
১৪. শতপথ ব্রাহ্মণ -১০/৬/৫-৯
১৫. শ্রীমদ্ভগবদগীতা -৪/৩৪
১৬. প্রাগুক্ত, ছান্দোগ্য উপনিষদ -৪/১০/১-৩
১৭. তদেব-৪/৭/১-৪
১৮. প্রাগুক্ত, মুণ্ডকোপনিষদ -১/২/১৩
১৯. প্রাগুক্ত, তৈত্তরীয়োপনিষদ-১/১
২০. প্রাগুক্ত, মৈত্রায়ণ ব্রাহ্মণোপনিষদ-৬/২৯
২১. এন.এন.মজুমদার; প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা, পৃ. ৩৬
২২. প্রাগুক্ত, ছান্দোগ্যে উপনিষদ -৭/১/৭
২৩. তৈত্তরীয়োপনিষদ-৩/১
২৪. ড. আর. কে. মুখার্জি : প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা, পৃ. ৯১
২৫. প্রাগুক্ত, ছান্দোগ্যে উপনিষদ -৬/১/৭
২৬. তদেব-৫/১১/৭
২৭. তদেব-৪/৯/৩
২৮. এফ.কে.কে.: প্রাচীন ও পরবর্তী সময়ে ভারতীয় শিক্ষা, পৃ. ২৭
২৯. নিরুক্ত-২/৩/৪
৩০. আর.কে. মুখার্জি, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা, পৃ. ৩৭
৩১. তাণ্ড. ব্রাহ্মণ-৪/১/৪, কাত্যায়ন শৌতসূত্র, ভূমিকা, পৃঃ -৫৩, বিদ্যাধর শর্মা;শৌতযজ্ঞ পরিচয় -:(গবাময়ন সূত্রম্) পৃঃ ৪৭ বিদ্যাধর গৌড় দ্বারা সম্পা।
৩২. ড.আর, কে. মুখার্জি: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৩৩. তদেব- পৃ. ৬১-৬২
৩৪. প্রাগুক্ত, ছান্দোগ্যে উপনিষদ -৭/১,৩/১০
৩৫. প্রাগুক্ত, বৃহদারণ্যক উপনিষদ -২/৪/১০
৩৬. শতপথব্রাহ্মণ-২/৬/৪-২-৭,৪/৬/৭/৯/২
৩৭. কাঠকসংহিতা-৩৭/১/৭
৩৮. কে.এম.পানিকর: ভারতীয় ইতিহাসের একটি সমীক্ষা, পৃ. ১৩
৩৯. ঋগ্বেদ -৭/১০/৩
৪০. ধীরেন্দ্র বর্মা: হিন্দি ভাষার ইতিহাস, পৃ. ২৯
৪১. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ - ৪
৪২. প্রাগুক্ত, তৈত্তরীয়োপনিষদ-১/২, ম্যাকডোনেল এর বৈদিক গ্রামার, অধ্যায় -৪
৪৩. পাণিনিশিক্ষা-৫/৫২, পতঞ্জলি মহাভাষ্য
৪৪. ড.আর কে মুখার্জি: প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা পৃ. ৩৬
৪৫. নিরুক্ত-১/১৮/৯
৪৬. প্রাগুক্ত, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা - পৃ. ৩৬

৪৭. প্রাগুক্ত, বৃদদারণ্যক উপনিষদ - ৪/৪/৬
৪৮. প্রাগুক্ত, শুকরহস্যোপনিষদ - ৩/১৩
৪৯. প্রাগুক্ত, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা, পৃ. ২৭১
৫০. ঋগ্বেদ -১০/১০৯/৫
৫১. "Not obligatory till 400 B.C". Altekar, পৃ. ২৬৯
৫২. শতপথ ব্রাহ্মণ -১১/৫/৪
৫৩. প্রাগুক্ত, কৌষিতকী উপনিষদ -৪/১৯, ছান্দোগ্য উপ-৩০০/৪/৪/৫, মুণ্ডা উপ-১/২/১২, প্রশ্নপোনিষদ-১/১
৫৪. ঊনবিংশতিসংহিতা, অশোক মুখোপাধ্যায় সম্পা, ১৪০৭, গৌতম-২/৪৫-৭
৫৫. তদেব, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি-১/৩৬, পৃ. ১৪-১৫
৫৬. প্রাগুক্ত, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা, পৃ. ১৯১
৫৭. প্রাগুক্ত, আপস্তম্ব-১,২,৮,৩০
৫৮. মনুসংহিতা - ২/১৫৯-৬১/
৫৯. প্রাগুক্ত, গৌতমসংহিতা -১, ২/৪৮, ৫৩/
৬০. ঈশান ঘোষ, জাতক, তিলমুট্টি জাতক-২৫২, জাতক কথা (ভাগ-৩) : ভদন্ত আনন্দ কৌসল্যায়ন, পৃ. ৯
৬১. ড.এ.এস.অলটেকর্: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
৬২. এফ.ই.কে. : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
৬৩. মনুস্মৃতি-১/৮৮/৯১, পৃঃ ২৮, কুল্লুকভট্ট প্রণীত মন্বর্থমুক্তবলী টীকা, হিন্দি টীকা হরগোবিন্দ শাস্ত্রী
৬৪. ড.এ.এস.অলটেকর : প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
৬৫. এডভান্স হিস্ট্রি অফ্ ইণ্ডিয়া, পৃ. ৩৩
৬৬. কে.এম.পানিক্কর : এ.সার্ভে.অফ্ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি পৃ. ১২
৬৭. বাজসনেয়সংহিতা-২৬/২
৬৮. এডভান্স হিস্ট্রি অফ্ ইণ্ডিয়া, পৃ. ২৬/২
৬৯. নিযুক্ত, যাস্ক-৬/৭
৭০. ভগবতশরণ শর্মা: প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, পৃঃ -৫৪
৭১. ড.আর.কে. মুখার্জি: প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা, পৃঃ -১৫৪
৭২. প্রাগুক্ত বৃহদারণ্যক উপনিষদ -২/১/১-২০
৭৩. প্রাগুক্ত, ছান্দোগ্য উপনিষদ -৫/৩/১-৭
৭৪. কৌষীকি ব্রাহ্মণ উপনিষদ -১/১/
৭৫. কাঠকসংহিতা-৩৭/১, কৌশিকসূত্র-৩০
৭৬. ড.আর.কে.মুখার্জী : প্রাগুক্ত, পৃঃ -১৫৪
৭৭. ঋগ্বেদ -৫/৪৫/৬ ,১/১১১-১২
৭৮. ডঃ.আর.কে.মুখার্জী: প্রাগুক্ত -পৃঃ-১৫৪
৭৯. এন. এন. মজুমদার এ হিস্ট্রি অফ্ এডুকেশন ইন এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া, পৃ. ৫৮
৮০. ওয়েবার : হিস্ট্রি অফ্ ইন্ডিয়ান্ লিটেরেচর্, পৃ. ২১
৮১. ডঃ.আর. কে মুখার্জি: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
৮২. বার্তিক-৪/১; ৬৩
৮৩. ডঃ.আর. কে. মুখার্জি: প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
৮৪. তদেব, পৃ. ৮৩

৮৫. প্রাগুক্ত,বৃহদারণ্যক উপনিষদ -৬/২/১/৭
৮৬. ড. আর. কে. মুখার্জি : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
৮৭. প্রাগুক্ত, কঠোপনিষদ-১/২/৮
৮৮. প্রাগুক্ত, মুণ্ডকোপনিষদ -১/২/৮
৮৯. তদেব-১/২/১২
৯০. প্রাগুক্ত, মৈত্রায়ণোপনিষদ্-৬/২৯
৯১. প্রাগুক্ত, তৈত্তরীয়োপনিষদ-১/৪/২
৯২. তদেব-১/১১
৯৩. প্রাগুক্ত, কঠোপনিষদ-১/২/২৩
৯৪. প্রাগুক্ত, মুণ্ডকোপনিষদ -১/২/১২
৯৫. প্রাগুক্ত, শ্বেতাশ্বরোপনিষদ্-৬/২৩
৯৬. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-৪/৩৪
৯৭. প্রাগুক্ত, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি,৩/২৩৬/২৪২
৯৮. স্মৃতিচন্দ্রিকা-পৃ. ১৪০
৯৯. সংস্কৃত সম্ভার, মালবিকাগ্নিমিত্রম্-১/১৭
১০০. মনুস্মৃতি -২৪৫/৬
১০১. কালিদাস, সংস্কৃত সম্ভার রঘুবংশ, ৫/২৪
১০২. মিলিন্দপ্রশ্ন, - ১/১৭
১০৩. ডঃ এ. এস. আলতেকার: এডুকেশন ইন্ এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া, পৃ. ৮১
১০৪. তদেব, পৃ. ৮২, পাদটীকা
১০৫. তদেব, পৃ. ৮২